হিযবুত তাহ্‌রীর-এর প্রতিষ্ঠাতা আমির শাইখ আল্লামা তাক্বি উদ্দীন নাবাহানি (র.)

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর প্রতিষ্ঠাতা তাক্বি উদ্দীন বিন ইব্রাহিম বিন মুস্তাফা বিন ইসমাঈল বিন ইউসুফ আল-নাবাহানি বনি নাবাহান বংশের সাথে সংযুক্ত। তিনি ১৩৩২ হিজরী (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ) উত্তর ফিলিস্তিনের হাইফা শহরের আজযাম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার জ্ঞান, দ্বীনের চর্চা ও তাকওয়ার জন্য পরিচিত ছিল। তাঁর পিতা, শাইখ ইব্রাহিম, একজন বিচারক এবং জ্ঞান ও কলা মন্ত্রণালয়ের অধীনে শারী'আহ্ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তার মাতাও একজন শারী'আহ্ বিশারদ ছিলেন, যা তিনি তার পিতা শাইখ ইউসুফ আল নাবাহানির কাছ থেকে অর্জন করেছিলেন।

বিভিন্ন বর্ণনায় তার নানা সম্পর্কে এসেছে – শাইখ ইউসুফ বিন ইসমাঈল বিন ইউসুফ বিন হাসান বিন মোহাম্মদ আল নাবাহানি আল শাফঈ – তার কুনিয়াত ছিল 'আবু আল মাহসিন' এবং তিনি ছিলেন একজন কবি, সুফী এবং সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব। তিনি তার সময়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিচারক ছিলেন। তিনি নাবলুসের জেনিন শহরে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি ইস্তাম্বুলে স্থানান্তরিত হন, যেখানে তিনি বিচারক হিসেবে মাসুল শহরের কাভি সানজাক এলাকায় দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি আল আযকিয়াহ্ এবং আল কুদ্‌সের রয়েল কোর্টের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব লাভ করেন। অতঃপর তিনি বৈরুতের 'অধিকার সম্পর্কিত' কোর্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ৪৮টি বইয়ের লেখক ছিলেন।

শাইখ তাক্বি উদ্দীন এর ইসলামী ব্যক্তিত্বের বেশিরভাগই তাঁর পরিবারের কাছ থেকে এসেছে। তিনি ১৩ বছর বয়সে পবিত্র কুর'আন শরীফ মুখস্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর নানার জ্ঞান ও চিন্তা দ্বারা ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর থেকে যতটা পেরেছেন আত্মস্থ করেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, বিশেষ করে তাঁর নানা উসমানী খিলাফতের পক্ষে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তা থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নানা শাইখ ইউসুফ কর্তৃক আয়োজিত আইন বিষয়ক বিতর্ক ও আলোচনা থেকে তিনি অনেক উপকৃত হয়েছিলেন। এই সকল আলোচনা সভায় তিনি তাঁর নানার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এজন্য শাইখ ইউসুফ, শাইখ তাক্বি'র পিতাকে উৎসাহিত করেন তাঁকে আল-আযহারে পাঠানোর জন্য, যাতে তিনি 'উলূম-ই-শরয়ী' এর ওপর জ্ঞান আহরণ করতে পারেন।

জ্ঞানার্জন:

শাইখ তাক্বি, আল আযহারে ১৯২৮ সালে অষ্টম গ্রেডে ভর্তি হন এবং একই বছর কৃতিত্বের সাথে পরীক্ষা শেষ করেন। তিনি 'শুহাদা আল গুরবা' সনদ অর্জন করেন। এরপর তিনি বিজ্ঞান কলেজে ভর্তি হন, যা তখন আল আযহারের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। তিনি জ্ঞান অন্বেষণে বিভিন্ন শাইখের আলোচনা সভায় অংশ নেন, যাদের সম্পর্কে তাঁর নানা তাঁকে অবহিত করেছিলেন; যেমন, শাইখ মুহাম্মাদ আল খিজার হোসাইন (র.)। শিক্ষার পুরাতন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের জন্য এসব পাঠচক্রে অংশগ্রহণ উন্মুক্ত ছিল। শাইখ নাবাহানি এসব পাঠচক্রে নিয়মিত অংশ নিতেন, যদিও তিনি বিজ্ঞান কলেজে পড়াশুনা করতেন। কায়রোসহ বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত বিতর্ক সভায় তিনি গভীর জ্ঞান, সুচিন্তিত মতামত এবং তীক্ষ্ণ যুক্তি-তর্কের স্বাক্ষর রাখেন, যা দেখে তাঁর সমসাময়িক ছাত্র-শিক্ষকরা পর্যন্ত তাঁর জ্ঞানের হিংসা করতেন।

শাইখ যে ডিগ্রিসমূহ অর্জন করেছিলেন সেগুলো হলো – আল আযহার থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, *'শাহাদা তাল গুরবা'* আল আযহার থেকে, কায়রো দার উল উলূম থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রি, বিচারক হওয়ার ডিগ্রি *'মা'হাদ আল আ'লা ইনস্টিটিউট'* থেকে, যা শারী'আহ্ কোর্টের অধিভুক্ত ও আল আযহারের সাথে সংশ্লিষ্ট, এবং ১৯৩২ সালে আল আযহার থেকে শারী'আহ্ এর ওপর *'শাহাদা তাল আ'লামিয়াহ্'* মাস্টার্স ডিগ্রি।

শাইখ যে সকল পদে আসীন ছিলেন:

শাইখ ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত জ্ঞান ও কলা মন্ত্রণালয়ের অধীন শরয়ী' শিক্ষা ডিপার্টমেন্টে কর্মরত ছিলেন। তিনি পদোন্নতি পেয়ে শরয়ী' কোর্টে বদলি হন এবং হাইফার কেন্দ্রীয় কোর্টে এটর্নি হিসেবে নিযুক্ত হন। এরপর তিনি সহকারী বিচারক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। অতঃপর ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত রামাল্লাহ্'র কোর্টে বিচারক হিসেবে কর্মরত থাকেন। ইহুদীদের দ্বারা ফিলিস্তিন দখলের পর তিনি সিরিয়ায় চলে যান এবং একই বছর আল কুদ্‌সের শরয়ী' কোর্টের বিচারক হিসেবে ফিরে আসেন। অতঃপর ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি হাইকোর্টের শরয়ী' বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি উক্ত পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং ওমানের 'উলূম-ই-ইসলামিয়া' কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। জ্ঞানের সকল শাখায়ই ছিল তাঁর সর্বোচ্চ দখল। তিনি ছিলেন *মুজতাহিদ মুতলাক* এবং *মুহাদ্দিস*।

শাইখ তাক্বির লিখিত বইসমূহ:

১) ইসলামের ব্যবস্থাসমূহ

২) দল গঠন প্রণালী

৩) **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর ধারণাসমূহ

৪) ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

৫) ইসলামের সামাজিক ব্যবস্থা

৬) ইসলামের শাসন ব্যবস্থা

৭) খিলাফত রাষ্ট্রের সংবিধান

৮) সংবিধানের ভূমিকা

৯) ইসলামী রাষ্ট্র

১০) ইসলামী ব্যক্তিত্ব (খন্ড: ১-৩)

১১) **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর রাজনৈতিক ধারণাসমূহ

১২) রাজনৈতিক চিন্তা

১৩) একটি উষ্ণ আহ্বান

১৪) খিলাফত

১৫) চিন্তা

১৬) স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তা

১৭) সামাজিক স্তরে দাওয়াহ্‌ শুরুর পর্যায়

১৮) সমাজে প্রবেশ

১৯) লিসলাহ-ই মিশর

২০) আল ইত্তেফাক্বিয়াত আস সানিয়া আল মাসতিয়া আল সুরিয়া ওয়াল ইয়ামনিয়া

২১) হাল ক্বাদীহ ফালাস্তিন আ'লা তারিক্বা তাল আমরিকিয়া ওয়াল ইঙ্গলিজীয়া

২২) নাজরিয়া আল ফারাগ আল সিয়াসি হুল মাশরুউ' ইজান হাওয়ার

এছাড়া রয়েছে শত শত বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর নিবন্ধ।

যখন তাঁর বই ও নিবন্ধ প্রকাশনাসমূহ নিষিদ্ধ করা হয়, তখন তাঁর যেসব পুস্তক অন্যদের নামে প্রকাশ হয়-

১) অতুলনীয় অর্থনৈতিক পলিসি

২) মার্ক্স এর কম্যুনিজমের ভ্রান্তিসমূহ

৩) খিলাফত কিভাবে ধ্বংস হয়েছিল

৪) ইসলামের সাক্ষ্য আইন

৫) ইসলামের দন্ডবিধি

৬) নামাজের নিয়ম

৭) ইসলামী চিন্তা

হিযবুত তাহ্‌রীর প্রতিষ্ঠার পূর্বে তিনি দু'টি বই লিখেছিলেন: আনকাজ ফালাস্তিন, রিসলাতাল আরাব।

তাঁর চরিত্র ও গুণাবলী:

যুহাইর কাহালা, ইসলামী বিজ্ঞান কলেজের একজন শিক্ষক যিনি প্রশাসনেরও দায়িত্বে ছিলেন; শাইখ তাক্বি একই কলেজে কর্মরত থাকাকালীন তিনিও ঐ কলেজে চাকুরিরত ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, "শাইখ ছিলেন একজন বুদ্ধিমান, মহান এবং একজন স্বচ্ছ মনের মানুষ। তিনি একনিষ্ঠ, মর্যাদাসম্পন্ন এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। মুসলিম উম্মাহ্'র হৃদয়ের মধ্যে ইহুদি সত্ত্বার উপস্থিতি তাঁকে একইসাথে দুঃখিত ও রাগান্বিত করেছিল।"

তিনি ছিলেন মাঝারী উচ্চতার অধিকারী, স্বাস্থ্যবান, সদা সক্রিয় ও স্পষ্টবাদী বিতার্কিক। তাঁর সকল কর্মকান্ডে ছিল মেধা ও গতিশীলতার স্বাক্ষর। তিনি তাঁর যুক্তি উপস্থাপনে ছিলেন অদ্বিতীয়। যা তিনি হক্ব বলে বিশ্বাস করতেন, তার সাথে কখনও আপোষ করেননি। তাঁর দাড়ি ছিল লম্বায় মধ্যম ও কাঁচা-পাকা ধরনের। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল সম্মোহনী এবং তাঁর কথোপকথন ছিল প্রভাব বিস্তারকারী। তাঁর যুক্তি অন্যদেরকে হতবিহ্বল করে দিত। তিনি উদ্দেশ্যহীন সংগ্রাম, ব্যক্তিগত আক্রমণ ও উম্মাহ্'র স্বার্থ থেকে বিচ্যুতি তীব্রভাবে ঘৃণা করতেন। ব্যক্তিগত জীবনের ব্যস্ততা নিয়ে হারিয়ে যাওয়াকে তিনি অপছন্দ করতেন। তিনি সবসময় উম্মাহ্'র শুভ কামনায় ব্যস্ত ও চিন্তিত থাকতেন। **"যে উম্মাহ্'র খোঁজ-খবর নেয় না, সে আমার দলভুক্ত নয়"**- নবী (সাঃ) এর এই হাদিসের তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। তিনি এই হাদিসটি বারবার বলতেন এবং তাঁর ব্যস্ততার যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করতেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করতেন যে, ইমাম গাজ্জালী (র.) ক্রুসেডারদের আক্রমণের সময়ে 'এহিয়াএ উলূম উদ দ্বীন' বই লেখায় ব্যস্ত ছিলেন।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর প্রতিষ্ঠা ও এর পথ চলা:

শাইখ তাক্বি উদ্দীন চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর পরে প্রতিষ্ঠিত দল, আন্দোলন এবং সংগঠনগুলো বিশ্লেষণ করেন। তিনি তাদের কাজের ধরনসমূহ, চিন্তা, সমাজে প্রভাব বিস্তার করার প্রক্রিয়া ও তাদের ব্যর্থতা ইত্যাদি বিষয় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। যেহেতু শাইখ খিলাফত বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হিসেবে একটি দলের উপস্থিতি অত্যাবশ্যকীয় মনে করতেন, সেজন্য তিনি অন্যান্য দলসমূহকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ধিকৃত মোস্তাফা কামাল পাশা 'আতা তুর্ক' এর হাতে খিলাফত শাসনব্যবস্থা ধ্বংসের পর, অনেক ইসলামী আন্দোলনের উপস্থিতির পরও মুসলিমরা খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। বৃটিশদের দালাল জর্দান, মিশর ও ইরাক সরকারের সহায়তায় ১৯৪৮ সালে ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিনের ভূমি দখল এবং ইহুদীদের কাছে আরবদের অসহায়ত্ব শাইখ তাক্বি উদ্দীনের অনুভূতিকে বেশি আলোড়িত করে। এরপর তিনি কারণ অনুসন্ধান শুরু করলেন যা মুসলিম উম্মাহ্'কে পুনর্জাগরণের দিকে নিয়ে যাবে। শাইখ প্রথমে মুসলিম উম্মাহ্‌র পুনর্জাগরণের জন্য দু'টি বই লিখেন: ১. আরবদের বার্তা এবং ২. আনকাজ ফিলিস্তিন। এই বইগুলো ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইসমূহে শুধু চিন্তা, আক্বিদা ও উম্মাহ্‌র প্রকৃত সমাধান তথা ইসলামের বার্তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ বইগুলোতে বলা হয় আরবদের শুধু ইসলামের ভিত্তিতেই পুনর্জাগরণ খোঁজা উচিত। আরব জাতীয়তাবাদীদের বার্তা শায়খের বার্তা থেকে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আরব জাতীয়তাবাদী কর্তৃক প্রচারিত চিন্তা উম্মাহ্ ও ইসলামের প্রকৃত বার্তার মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান ছিল; ফলে তাদের বার্তা উম্মাহ্'কে ইসলাম থেকে আরো দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল। তাদের বার্তার সাথে অনেক পশ্চিমা ধারণা জড়িত ছিল, যা ইসলামী আক্বিদা ও মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক। আরব জাতীয়তাবাদীদের ধারণাসমূহ, যা ছিল তাদের চলার পাথেয়, তা শাইখের সামনে উপস্থাপন করা হলে তিনি তা পড়েছেন, দেখেছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন। তাদের পরামর্শ ও সমাধানসমূহ পর্যালোচনা করেছেন। তিনি এসব ধারণায় ও পরামর্শে মোটেও সন্তুষ্ট ছিলেন না।

কোন সিদ্ধান্তে আসার আগে তিনি মিশরে যাদের সাথে দেখা হয়েছে ও যাদের সম্পর্কে জানতেন এমন সকল শাইখদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। তিনি শাইখদের কাছে উম্মাহ্'র পুনর্জাগরণ ও উজ্জ্বলময় অতীত ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি দল গঠন করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এজন্য তিনি ফিলিস্তিনের সর্বত্র ঘুরে বেড়ান এবং বিখ্যাত সকল শাইখ ও বুদ্ধিজীবীদের নিকট তাঁর চিন্তা ব্যক্ত করেন, যা তার মন ও মগজে প্রোথিত ছিল। তিনি এ লক্ষ্যে সেমিনারের আয়োজন করেন এবং ফিলিস্তিনের সকল এলাকা থেকে শাইখদের আমন্ত্রণ জানান। এইসব সেমিনারে তিনি পুনর্জাগরণের সঠিক কর্মপদ্ধতি নিয়ে শাইখদের সাথে বিতর্ক করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের বলেন তারা ভুল পদ্ধতিতে চেষ্টা করছেন এবং তাদের চেষ্টা কোন ফল দেবেনা। সেমিনারে অংশগ্রহণকারী এই চিন্তাবিদদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন বিভিন্ন ইসলামী, রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী দলের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও তিনি আল-আক্সা, আল-খালিলসহ বিভিন্ন মসজিদে অসংখ্য রাজনৈতিক ইস্যুতে বিভিন্ন সময়ে বিস্তারিত বক্তব্য প্রদান করতেন। তিনি আরব লীগের আসল চেহারা উন্মোচন করেছিলেন এবং বলতেন ওটা ছিল পশ্চিমা ঔপনিবেশিক

শক্তির ক্রীড়নক এবং এটা হলো তাদের অসংখ্য হাতিয়ারের মধ্যে একটি হাতিয়ার, যার মাধ্যমে পশ্চিমারা ইসলামী ভূমিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। শাইখ পশ্চিমাদের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র তুলে ধরতেন এবং পশ্চিমাদের ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী পরিকল্পনার আচ্ছাদন উন্মোচন করে দিতেন। তিনি মুসলিমদের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা ও সত্যিকার ইসলামের ওপর ভিত্তি করে দল গঠনের আহ্বান জানাতেন।

শাইখ তাক্বি উদ্দীন প্রতিনিধিত্বকারী সভার প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন, যা ছিল শুধু পরামর্শ সভা কমিটি। কিন্তু তাঁর সুদৃঢ় মতামত, রাজনৈতিক কর্মকান্ড, ইসলামী রাজনৈতিক দল গঠনে তাঁর জোরালো ভূমিকা ও ইসলামকে আঁকড়ে ধরার মানসিকতার কারণে সরকার নির্বাচনের ফলাফল তাঁর বিপক্ষে ঘুরিয়ে দেয়।

এই ঘটনা শাইখকে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখতে, বা তাঁর দৃঢ় মনোবলকে দুর্বল করে দিতে পারেনি বরং তিনি সমর্থক সংগ্রহ ও বিতর্ক করে গেছেন। তাঁর এই কার্যক্রমের মাধ্যমে তিনি দল গঠনে সফলভাবে বিখ্যাত শিক্ষানুরাগী, বিচারক এবং রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তাঁর চিন্তা ও কাঠামো এই সকল বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সামনে উপস্থাপন করেন, যা **হিযব্**-এর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। কিছু বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ তাঁর চিন্তাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং সমর্থন দান করেছিলেন; এভাবে তাঁর দল গঠন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়।

আশীর্বাদপুষ্ট শহর আল-কুদসেই **হিযব্**-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল, যেখানে শাইখ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক ছিলেন। ঐসময় তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ করেন; এদের মধ্যে কালকীলার শাইখ আহমদ দাউর, মিশরের সাইয়্যেদান নিমর্, রামাল্লার দাউদ হামদান, আল খালিলের শাইখ আব্দুল কাদিম যাল্লুম, আদিল আল নাবলুসি, গানিম আব্দুহ, মুনীর শাকীর, শাইখ আস'আদ বিউয তামিমি প্রমুখ।

শুরুতে প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যকার মিটিং ছিল অসংগঠিত এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে। বেশিরভাগ মিটিংই আল কুদ্স বা আল খালিলে সংঘটিত হয়েছিল যেখানে লোকদের হিযবে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান ও এ নিয়ে বিতর্ক হতো। বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিল উম্মাহ্'র জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী বিষয়সমূহ। এই ধারা ১৯৫২ সালের শেষ অবধি চলতে থাকে যখন এই লোকসকল একটি রাজনৈতিক দল গঠনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

হিযব্-এর পাঁচজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ১৯৫২ সালের ১৭ নভেম্বর জর্ডানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার অনাপত্তিপত্র (এনওসি) প্রদানের অনুরোধ জানান। এই সদস্যগণ হলেন -

১. তাক্বি উদ্দীন নাবাহানী - প্রধান

২. দাউদ হামদান - উপপ্রধান এবং সেক্রেটারী

৩. গানিম আব্দুহ - অর্থ বিষয়ক দায়িত্বশীল

৪. আদিল আল নাবুলসি - সদস্য

৫. মুনীর শাকীর - সদস্য

এরপর **হিযব্** সকল আইনগত বিষয়াদি সম্পাদন করে, যা জর্ডানে বলবৎ উসমানি আইনে দল গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। **হিযব্**-এর কেন্দ্রীয় অফিস ছিল আল কুদসে এবং এই দল কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মকান্ডই উসমানি আইন অনুযায়ী সঠিক ছিল।

হিযব্ কর্তৃক আল সারেহ সংবাদপত্রে (ইস্যু নং ১৭৬, ১৪ মার্চ, ১৯৫৩/২৮ জমাদিউল আউয়াল, ১৩৭২ হিজরী) দলের 'গঠনতন্ত্র এবং পরিচালনার শর্তাবলী' প্রকাশের পর, **হিযবুত তাহ্রীর** একটি বিধিবদ্ধ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই দিনে **হিযবুত তাহ্রীর** কার্যক্রম পরিচালনার আইনগত অধিকার পায়, যা ছিল রাষ্ট্রের আইনানুগ।

অথচ সরকার **হিযব্**-এর সকল (পাঁচজন) প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং এদের মধ্যে ৪ জনকে গ্রেফতার করে। ২৩ মার্চ, ১৯৫৩ (৭ রজব, ১৩৭২ হিজরী) সালে সরকার এক বিবৃতির মাধ্যমে **হিযব্**-কে নিষিদ্ধ করে এবং এর প্রতিষ্ঠাতাদের সকল প্রকার কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। সরকারের আদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ১ এপ্রিল **হিযব্**-এর আল কুদসের অফিসের সকল ব্যানার ও পোস্টার খুলে ফেলা হয়।

শাইখ তাক্বি সরকারের নিষেধাজ্ঞাকে তোয়াক্কা না করে কাজ অব্যাহত রাখেন। যে উদ্দেশ্যে **হিযব্** গঠিত হয়েছে তিনি সে বার্তা ছড়াতে থাকেন। দাউদ হামদান এবং নিমর মিশরী ১৯৫৬ সালে নেতৃত্বের পদ থেকে সরে দাঁড়ান এবং শাইখ আব্দুল কাদিম

যাল্লুম এবং শাইখ আহমাদ দাউর তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হন। এই মর্যাদাবান মনীষীরা **হিযব্**-এর নেতৃত্বে আসেন এবং এই মহিমান্বিত আহ্বানের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেন।

ইসলামী জীবনব্যবস্থা পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে **হিযব্** আল আকসা মসজিদে জমায়েত হবার স্থানে সমষ্টিগতভাবে উম্মাহ্'কে উদ্বুদ্ধ করার কাজ করে যায়। **হিযব্**-এর আশ্চর্যজনক কর্মকান্ড দমনে তৎকালীন সরকার সস্তা উপায় অবলম্বন করে যাতে করে হিযব একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হতে না পারে। শাইখ তাক্বি এই পরিস্থিতির প্রাক্কালে এ অঞ্চল ১৯৫৩ সালের শেষের দিকে ত্যাগ করেন এবং দ্বিতীয়বার তাঁকে ফিরে আসতে দেয়া হয়নি।

শাইখ তাক্বি ১৯৫৩ সালে সিরিয়া চলে যান এবং সেখানে সিরিয়ার সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে লেবাননে নির্বাসনে পাঠায় কিন্তু লেবাননের সরকার তাঁকে ঢুকতে বাধা দেয়। শাইখ তাক্বি যখন আল হারীর উপত্যকায় পুলিশ ষ্টেশনে লেবাননে ঢোকার অনুমতি চাইলেন, তখন দায়িত্বরত কর্মকর্তা তাঁকে বাধা দেয়। তখন তিনি তাঁর বন্ধুকে খবর দিতে চাইলে অফিসার তাঁকে অনুমতি দেয়। শাইখ তাঁর বন্ধু মুফতি শায়খ হাসান আল আ'লাকে ডেকে তাঁর অবস্থা খুলে বললেন। শাইখ আল আ'লা সাথে সাথে অফিসারদের হুমকি দিয়ে বললেন শায়খ তাক্বিকে ঢুকতে না দিলে তিনি এই খবর ছড়িয়ে দেবেন যে একজন সম্মানিত শাইখকে গণতান্ত্রিক সরকার দেশে ঢুকতে দিচ্ছে না। লেবানন সরকার বিষয়টি আমলে নেয় এবং শাইখ তাক্বিকে ঢোকার অনুমতি দেয়।

শাইখ তাক্বি লেবাননে আসার পর নিজের চিন্তা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৯৫৮ সাল অবধি উল্লেখযোগ্য কোন বাধার সম্মুখীন হননি। লেবাননের সরকার যখন তাঁর চিন্তার ভয়াবহতা বুঝতে পারল তখন তাঁকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। শাইখ তখন বৈরুত ছেড়ে গোপনে লেবাননের ত্রিপলি শহরে চলে যান। শাইখের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু বলেছেন, শাইখ বেশিরভাগ সময়ই লেখা ও পড়ায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। তিনি রেডিওতে বিশ্বসংবাদ শুনতেন এবং মেধাদীপ্ত সব রাজনৈতিক বিবৃতি দিতেন। তাঁর নামের অর্থ যেমন, তিনি তেমনি ধার্মিক ছিলেন - তাক্বি : ধার্মিক। তিনি সর্বদা তাঁর জিহ্বা সংবরণ ও দৃষ্টিকে অবনত রাখতেন। তাঁকে কখনও কোন মুসলিমের প্রতি রূঢ় হতে শোনা যায়নি। কাউকে কখনও অপমান করতে শোনা যায়নি, বিশেষ করে অন্যান্য দলের দাওয়াহ্ বহনকারী যারা ইজতিহাদগত কারণে তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন।

শাইখ ইরাকে নুসরাহ্ (নিষ্ঠাবান সামরিক অফিসারদের সমর্থন) অর্জনে বিশেষ গুরুত্ব দেন। এই উদ্দেশ্যে শাইখ নিজে বেশ কয়েকবার শাইখ আব্দুল কাদিম যাল্লুমকে নিয়ে ইরাক গমন করেন; উপসেনাপ্রধান (ও পরবর্তীতে ইরাকের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট) আব্দুল সালাম আরিফ এর মতো কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জন্য যাল্লুম সেখানে ছিলেন। শেষবারে ইরাক ভ্রমনে শাইখকে গ্রেফতার করা হয় এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে তাঁকে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদে শাইখের কাছ থেকে তারা কোন তথ্য উদ্ধার করতে পারেনি। শাইখ শুধু বলে গেছেন, তিনি একজন বৃদ্ধ লোক ইরাক ভ্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল চিকিৎসা। প্রকৃতপক্ষে শাইখ সেখানে অসুস্থ উম্মাহ্'র চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন, যা ছিল - খিলাফত। ইরাকি সরকার যখন কোন তথ্য উদ্ধার করতে পারেনি, তারা তাঁর হাত ভেঙে দিয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত করে, প্রচন্ড নির্যাতনে তখন তিনি ছিলেন রক্তাক্ত। যখন তাঁকে নির্বাসিত করা হয় তখন জর্ডানের গোয়েন্দারা ইরাকি গোয়েন্দাদের জানায় বন্দী লোকটি আসলে ছিল শাইখ তাক্বি, যিনি ইরাকি গোয়েন্দাদের কাছে ছিলেন অতি আকাঙ্খিত ব্যক্তি। কিন্তু, আলহামদুলিল্লাহ্, শাইখ এরই মধ্যে তাদের নাগালের বাইরে নিরাপদ দূরত্বে চলে গিয়েছিলেন।

হিযব্ প্রতিষ্ঠায় শাইখ তাক্বি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এবং তিনি যখন ইহকাল ত্যাগ করেন তখন তিনি ছিলেন তাঁর প্রত্যাশিত গন্তব্যের সন্নিকটে।

এই মহান উম্মাহ্ শাইখ তাক্বিকে শনিবার, ফজরের সময় (১ মুহাররম, ১৩৯৮) ১১ ডিসেম্বর, ১৯৭৭ সালে বিদায় জানায়। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন মহান নেতা, অগাধ জ্ঞানের অধিকারী, নিঃসন্দেহে বর্তমান সময়ের একজন মহান বিচারক, ইসলামী চিন্তার পুনর্জাগরণকারী, বিংশ শতাব্দির সবচেয়ে মহান চিন্তাবিদ, প্রকৃত মুজতাহিদ ও একজন অনুসরণীয় মনীষী। শাইখকে বৈরুতের আল ওযায়ি' কবরস্থানে দাফন করা হয়। শাইখ যে উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন ও চেষ্টারত ছিলেন তিনি তাঁর ফল ভোগ করে যেতে পারেননি। তিনি খিলাফত রাষ্ট্র দেখে যেতে পারেননি, যে উদ্দেশ্যে হিযব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কিন্তু তিনি তাঁর এ দায়িত্ব তাঁর বিশ্বস্ত সহযোগী আব্দুল কাদিম যাল্লুমের ওপর রেখে সৃষ্টিকর্তার সাথে সাক্ষাত করেন। যদিও শাইখ নিজের চোখে খিলাফত দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা হিযব্-কে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ এই চিন্তাকে সমাদৃত করেছে। লক্ষ লক্ষ লোক এই চিন্তাকে গ্রহণ করেছে এবং যারা তাঁর মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হয়েছেন, তারা পৃথিবীর আনাচে কানাচে পৌঁছে গিয়েছেন। এমনকি আজও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যালিমদের কারাগারগুলো শাইখ কর্তৃক প্রচারিত চিন্তা গ্রহণ ও দাওয়াহ্ বহনের কারণে পরিপূর্ণ হয়ে আছে।